



## বাঙালি রমণীর পাকিস্তানি সৈন্যপ্রীতি

মুনতাসীর মামুন

বহুদিন পর ১৯৭১ সালের ঘাতক বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে বাংলাদেশের মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথমবার সব ধরনের (এদের অনেকে যে আগে এ দাবি করেননি তা নয়) রাজনৈতিক দলও একই দাবি তুলছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান, সেনাপ্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারও এর যৌক্তিকতা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। সিভিল সমাজ থেকে যেসব দাবি উঠেছে তার সারাংশ হলো—

১. যুদ্ধাপরাধীদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে এবং বাদী হবে সরকার/রাষ্ট্র;

২. ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল/রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে;

৩. যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচন করতে পারবে না। বিদ্যমান আইন ও সংবিধানের আলোকেই তা করা যেতে পারে। সরকারের একটি অংশ যার নেতৃত্বে আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, এটি মানতে নারাজ। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, সরকারের হাতে অনেক কাজ। সুতরাং বাড়তি এসব দায়িত্ব সরকার নিতে পারবে না। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, কেউ সংস্কৃত হলে আদালতে যেতে পারে। হয়তো এতে উৎসাহিত হয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালের আলবদর, মুজাহিদ ও কাদের মোল্লা এবং শাহ হালান নামে সাবেক এক সচিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করেছেন। ওই ৩ জন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিলেন। আদালত তা তদন্তের জন্য থানায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সরকার অনুমতি না দেওয়ায় পুলিশ তা আদালতে ফেরত পাঠায়। ব্যারিস্টার মইনুল বলেছেন, ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন, মাত্র কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তি ড. কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করলেন কীভাবে? এসব আশঙ্কা করেই আমরা দাবি করছি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা সরকারকেই করতে হবে। তবে এ ঘটনা প্রমাণ করে, ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে যতটা শক্তিশালী মনে হয় আসলে ততটা শক্তিশালী তিনি নন। আরো যুক্তি আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও জরুরি আইনের বিধান ৩ মাসের জন্য। সরকারের প্রধান কাজ নির্বাচন করা। হাট-বাজার ভাঙা, উপজেলা নির্বাচন দেওয়া, দুই নেত্রীকে গ্রেফতার করা, শিক্ষকদের গ্রেফতার করার কাজগুলো কে চাপালো তাদের কাঁধে? তারা বাড়তি কাজ হাতে নিয়েছেন দেখেই 'বাড়তি' দাবি তোলা হয়েছে। কর ফাঁকির জন্য গ্রেফতার করে ৭ থেকে ১০ বছর কারাদণ্ড দেওয়া যাবে আর ঘাতকদের কিছু করা যাবে না? এটা কি খুব হালকা এবং অদ্ভুত যুক্তি হয়ে গেল না? মইনুল হোসেন আরো বলেছেন, ৩৬ বছর যারা বিচার করেনি, তাদের বলুন। ব্যারিস্টার মইনুল ৩৬ বছর আগে সরকারি দলের এমপি ছিলেন দেখেই তো তার কথামতো তার কাছেই দাবি তোলা হচ্ছে।

ওই একই ধারায় জামায়াত নেতা ও সমর্থকরা বেশকিছু মন্তব্য করেছেন—

১. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, হয়েছিল গৃহযুদ্ধ।

২. সুন্দরী নারীর জন্য যুদ্ধ হয়েছিল।

৩. ভারতের স্বার্থরক্ষায় যুদ্ধ হয়েছিল।

৪. মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিচার করতে হবে।

জামায়াত দেশে স্টাবলিশমেন্টের সমর্থন পাচ্ছে। বিদেশেও কেউ কেউ একই রকম কথাবার্তা বলছেন। অনেকে বলতেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এসব কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটাবে। এসব কথা আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় সে বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে।

বিদেশে প্রচারের ধরনটা অন্যরকম। জামায়াত বা জামায়াত সমর্থকদের মতো স্থূল নয়। পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরা ১৯৭১ সালের গণহত্যা খাটো করে দেখার জন্য যে ধরনের প্রচার করছে, বিদেশি 'অ্যাকাডেমিশিয়ান'দের কেউ কেউ সে কৌশল নিয়েছেন। কৌশলটা এ রকম— কিছু হত্যা হয়েছিল, যুদ্ধ হলে অমনটি হয়, তবে গণহত্যা হয়নি। ধর্ষণ যুদ্ধ এক-আধটু হয়, সেটি ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তবে যে ২-৪ লাখ ধর্ষণের কথা বলা হয় তা 'ফ্যান্টাসটিক'। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ গবেষক শর্মিলা বসুর কিছু লেখালেখি।

লন্ডন থেকে আমার এক তরুণ সহকর্মী জানান, পাকিস্তানিরা বিজয় দিবস উপলক্ষে শর্মিলা বসুকে নিয়ে এসেছে আলোচনার জন্য। কী করা? আমি বললাম, অনেকে খবর হওয়ার জন্য এগুলো করে। আগে এসব উপেক্ষা করতাম। এখন দেখছি, উপেক্ষা করলে তাদের মিথ্যাচার সত্যে পরিণত হয়ে যায়— যেভাবে জেনারেল জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন। তাকে পরামর্শ দিয়েছি, নিয়মতান্ত্রিকভাবে এসব মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে, যেভাবে আমরা করছি বাংলাদেশে। প্রয়োজন হলে, এসব যারা বলে ও পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদেরও ত্যাগ করতে হবে সামাজিকভাবে।

শর্মিলা বসুর প্রবন্ধ আগে দেখিনি। এখন কৌতূহল হলো। ইন্টারনেট থেকে তা সংগ্রহ করলাম। এটি ছাপা হয়েছিল মুম্বাইয়ের বিখ্যাত পত্রিকা ইপিডলিউতে। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হলো, সম্পাদক এটি ছাপলেন কীভাবে? এটি শুধু মিথ্যাচারই নয়, পুরো একটি জাতিকে আঘাত করা। ইপিডলিউর প্রতিষ্ঠাতা শচিন চৌধুরী বেঁচে থাকলে এ অনাচার সম্ভব হতো না। আগেই বলেছি, আগে এসব লেখালেখি উপেক্ষা করতাম। কিন্তু এখন করা যাবে না, কারণ এ প্রবন্ধ পুরো একটি জাতির বিরুদ্ধে।

গবেষকরা কোনো প্রবন্ধ পড়ার আগে উৎস দেখেন। শর্মিলার প্রবন্ধের ধরনটা অ্যাকাডেমিক। তাই উৎস দেখলাম (এখানে বলে রাখা ভালো, উৎসের দৈর্ঘ্যের ওপর প্রবন্ধের মান নির্ভর করে না)। তার প্রবন্ধের নাম বেশ দীর্ঘ, ১৪টি শব্দের শিরোনাম। আজকাল পাশ্চাত্যে এ ধরনের একটি ফ্যাশন হয়েছে, এক্সট্রিম সর্ব শিরোনাম ব্যবহার করা। শিরোনাম দিয়ে একটি অ্যাকাডেমিক ভাব আনা। শর্মিলা বসুর প্রবন্ধের নাম— 'লুজিং দ্য ভিকটিম : প্রবলেমস অব ইউজিং উইম্যান অ্যাজ উইপনস ইন রিকার্ডিং দ্য বাংলাদেশ ওয়ার'। উৎসের মধ্যে আছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের ৮ম খণ্ড, শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত একটি সংকলন, শর্মিলার নিজের একটি প্রবন্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের একজন গবেষকের একটি বই। লন্ডনের জামায়াতভিত্তিক প্রকাশনার একটি বই আর পাকিস্তানের ৩টি। এর মধ্যে আছে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালের প্রকাশিত শ্বেতপত্র ও পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল মুখা ও নিয়াজি, তার নেওয়া পাকিস্তানি কিছু সেনা অফিসারের সাক্ষাৎকার অন্যতম। অর্থাৎ তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন পাকিস্তানি সূত্রের ওপর। এসব সূত্র তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এ উৎস বিশ্লেষণ করলে শর্মিলার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়।

১. শর্মিলার প্রবন্ধের মূল ফোকাস ১৯৭১ সালের ধর্ষণ নারী। তার বক্তব্য, বাংলাদেশের লেখক, গবেষক ও তাদের সমর্থক বিদেশি গবেষক লেখকদের মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণ নারীর সংখ্যা ২ থেকে ৪ লাখ কিন্তু শর্মিলার (ও পাকিস্তানিদের) মতে, আসলে সংখ্যা কয়েক হাজার যার, মধ্যে বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত





আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু তারপর সে কোথায় যাবে কেউ জানে না।

ধর্ষণের কথা কেউ বলেনি, তাই ধর্ষণ হয়নি এবং উল্লিখিত সংখ্যা অতিরঞ্জিত— এ লজিক খুবই অদ্ভুত। বাঙালি মহিলারা কি সবাই তসলিমা নাসরিন? শর্মিলা কি ধর্ষণ বিষয়টা বোঝেন এবং যুদ্ধকালীন ধর্ষণ। যেহেতু [অনুমান করে নিচ্ছি] তিনি যুদ্ধ দেখেননি তাই যুদ্ধের চরিত্র তিনি অনুধাবন করতে পারবেন না। তিনি কি বাঙালি? বাঙালি হোন না হোন, ধর্ষিত নারী কখনোই প্রকাশ করতে চান না তিনি ধর্ষিত হয়েছেন, তার পরিবারও। পাশ্চাত্যেও না। পাশ্চাত্যে যত ধর্ষণ হয় তার কয়টি রিপোর্ট করা হয়? আর প্রাচ্য, তারপরও বাংলাদেশ এবং তাও চার দশক আগের বাংলাদেশ, যে সময় নারীরা ঘরের বাইরেই প্রায় যেত না। যারা কখনো যুদ্ধ দেখিনি। সেখানে পুরুষ-নারী কারো বর্ণনায় ধর্ষণের বিষয়টি আসবে না। সেটি কলঙ্ক মনে করা হয় সামাজিকভাবে। যে নীলিমা ইব্রাহিমের বই থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই নীলিমা ইব্রাহিমের বইতেও এর ইঙ্গিত আছে। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে তখন খবর পান ৩০/৪০ ধর্ষিত নারীও চলে যাচ্ছে। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করে দেশ ত্যাগ না করার অনুরোধ জানান। এর মধ্যে ১৪/১৫ বছরের এক কিশোরীও ছিল। তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি আমার বাড়িতে থাকবে মেয়ের মতো’ মেয়েটি রাজি হয়নি। বলছে, ‘আপনি যখন থাকবেন না তখন কী হবে? যখন লোকে জানবে পাকিস্তানিরা আমাকে ধর্ষণ করছে তখন সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।’ নীলিমা ইব্রাহিম বললেন, ‘তুমি কি জান পাকিস্তানিরা তোমাকে নিয়ে কী করবে? মেয়েটি বলেছিল, ‘জানি, ওরা আমাকে বিদ্রি করে দেবে। কিন্তু ওখানে কেউ আমাকে চিনবে না।

মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতার সংখ্যা দিয়ে কী বোঝানো হয়? বাঙালিরা বলেন, দু’লাখ ধর্ষিত হয়েছে। তাতে পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতার মাত্রাটা বোঝানো হয়। শর্মিলা বলেন, হয়তো দু’হাজার ধর্ষিত হয়েছে, তাতে যুদ্ধের ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা হ্রাস পায়। শর্মিলাদের উদ্দেশ্যও তাই, যার সঙ্গে বিবেকবান পাকিস্তানিরাও একমত নন। বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। এই বিবেচনার কথা বলেছিলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত কলামিস্ট এমভি নকভি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বর্বরতার প্রতিবাদ করে তিনি ‘দ্য ডনে’ লিখেছিলেন। ‘ডন’ তা ছাপেনি দেখে ‘ডনে’ লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। করাচিতে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। ‘পাকিস্তানি বাহিনী ছিল,’ অকম্পিত স্বরে জানালেন নকভি, ‘বিশৃঙ্খলা লুটেরা বাহিনী। এরা লুট করেছে, ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব রকমের অপরাধ করেছে। এ সেনাবাহিনী কত বোধহীন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল টিক্কা খানের মন্তব্য। ঢাকা থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা যখন লুট, ধর্ষণ, হত্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, ধর্ষণের সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত [দেখুন, বেলুচিস্তানের কসাই নামে খ্যাত টিক্কার সঙ্গে শর্মিলার মতের মিল কত গভীর]। মাত্র তিন হাজার, মাত্র তিন হাজার মহিলা ধর্ষিত হয়েছে!’ তিনি ত্রে াধে, আবেগে এরপর আর কথা বলতে পারছিলেন না। উল্লেখ্য, গণহত্যার মাসখানেক পর টিক্কা পাকিস্তানে ফেরেন। সে সময়ই সরকারিভাবে তিনি ৩ হাজার ধর্ষণের কথা বলেছেন। নকভি এরপর যা বলেছিলেন তা হলো, একজনকেও যদি ধর্ষণ করা হয় সেটিও অপরাধ। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার গূঢ়ার্থ, রাষ্ট্রের ‘রক্ষক’ তো ধর্ষণ করতে পারে না। ধর্মীয় বিবেচনা যদি আনেন তাহলে এভাবে বলা যায়— তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার ছিল রাষ্ট্রের রক্ষক। তারা তাদের নাগরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমানত খেয়ানত করেছিল। ইসলাম ধর্মে আমানত খেয়ানত করার চেয়ে বড় পাপ কমই আছে।

বাঙালি কর্তৃক প্রবলভাবে বিহারি মহিলা ধর্ষণের উল্লেখ করেছেন শর্মিলা। ২৫ মার্চের [১৯৭১] আগে পাকিস্তানিদের হয়ে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ আরো কয়েক জায়গায় বিহারিরা দাঙ্গা শুরু করে। এ দাঙ্গায় উভয়পক্ষেই নিহত হয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমিত হয় বাঙালি রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপে। ২৫ মার্চের পর হানাদারদের সহযোগিতায় বিহারিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালিদের ওপর। ২৬-৩০ মার্চ বিহারিরা মিরপুরে কী করেছিল তার সাক্ষী আমি নিজে। সৈয়দপুরেও একই কাণ্ড হয়। বাঙালিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করে। সেখানে নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণের দু-একটা ঘটনাও ঘটতে পারে, যা কাম্য ছিল না। কিন্তু তখন যুদ্ধ চলছিল, নিরস্ত্র বাঙালিরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল। ওই ধরনের ঘটনা যদি ব্যাপক ঘটত তাহলে পাকিস্তানি (দুই অংশের) এমনকি বিদেশি পত্র-পত্রিকায়ও ব্যাপকভাবে তা ছাপা হতো। কিন্তু, বিহারিদের ওপর ‘প্রবল’ অত্যাচারের খবর পাওয়া যায় একমাত্র পাকিস্তানি ‘শ্বেতপত্র’ ও মাসকারেনহাসের লেখা প্রতিবেদনের এক অনুচ্ছেদে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বিহারিদের বরং পাকিস্তানিরা ব্যবহার করে প্রচারের উদ্দেশ্যে। আমরা যখন পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলাপ করি তখন দু-একজন জেনারেল ছাড়া বিহারিদের ওপর ‘প্রবল’ অত্যাচার ও ‘প্রবল ধর্ষণের’ কথা কেউ বলেননি। এবং সেসব জেনারেলও মৃদুভাবে তা বলেছেন। ১৯৭১ সালে নকভিকে সাংবাদিক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়ে ঢাকায়। হানাদারদের উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝানো যে, বিহারিদের ওপর প্রবল অত্যাচার হয়েছে, তাই পাকিস্তানিরা তাদের জানমাল রক্ষায় ব্যস্ত। নকভির ভাষায়, ‘আমাদের তথাকথিত একটি রিফিউজি ক্যাম্প নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে রাখা হয়েছিল বিহারিদের (লক্ষ্য করুন, ‘তথাকথিত’ শব্দটি) একজন পাঠান কর্নেল ছিলেন ক্যাম্পের কমান্ডার। কমান্ডার বললেন, এসব কথা শুনতে শুনতে [বিহারিদের ভাষ্য] যখন আমার রাগ লাগে, ক্লান্ত লাগে তখন গ্রামে গিয়ে কিছু মানুষ মেরে আসি।’ চিন্তা করে দেখুন, বললেন নকভি, ‘গ্রামের নিরীহ মানুষদের লাইন’ ধরিয়ে গুলি করে আসে। এ ধরনের প্রচুর কাহিনী আছে। এরা কি মানুষ, নাকি পশুরও অধম...।’ আর বাঙালিরা বাঙালি নারীদের ধর্ষণ করেছে। তাত্ত্বিকভাবে ঠিক। তবে বাস্তব হলো সেই বাঙালিরা ছিল হানাদার বাহিনীর সহযোগী জামায়াতে ইসলামীর ক্যাডার, আলবদর বা রাজাকার। শর্মিলা বসুও যেমন হানাদারদের সাফাই গাইছেন এখন, তেমন অনেক বাঙালি ছিল পাকিস্তানিদের সহযোগী। বাঙালিরা (মুক্তিযোদ্ধা) পশ্চিম পাকিস্তানি মহিলা ধর্ষণ করেছে এ ঘটনার বয়ান এই প্রথম শুনলাম। পাকিস্তানিরাও তা উল্লেখ করেনি। কারণ এটি অবাস্তবের অবাস্তব। শর্মিলা নিজেও তো নিয়াজির মেমোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেখানে জেনারেল নিজেই লেখেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্তানি মহিলাদের ধর্ষণ করেছে। শর্মিলা অবশ্য বলতে পারেন। সেসব পাকিস্তানি বাঙালি ছিল। পালাতে পারেনি বা স্বেচ্ছায় কিছু বাঙালি সৈন্য/অফিসার ১৯৭১ সালে পুরোটা হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে ছিল। এ যুক্তি দিলে অবশ্য আমার কিছু বলার থাকবে না।

সবশেষে একটি কথা বলি, শর্মিলা সব সময় মুক্তিযুদ্ধকে ‘গৃহযুদ্ধ’ বলে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানি সৈন্যপ্রেরী এই মহিলার জ্ঞাতার্থে বলি, যুক্তরাষ্ট্রের পর বাংলাদেশই বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ, যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং জয়ী হয়েছিল। তাই তাত্ত্বিকভাবেও এটিকে গৃহযুদ্ধ বলা সমীচীন নয়। এতে একটি রাষ্ট্রীয় জন্মকেই অপমান করা হয়।

পাকিস্তানি সৈন্যরা পাকিস্তান শুধু ভাঙেইনি, পাকিস্তানকে বার্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। পাকিস্তানি সিভিল সমাজকে [যাদের অনেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জেলে পর্যন্ত গিয়েছিলেন] তারা অস্ত্রের সাহায্যে দমন করে রেখেছে, যেখানে বীরত্বের কিছু নেই। নির্দিত এই সেনাবাহিনী পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে ভারতকে [তাদের ভাষায় হিন্দুস্থান] এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কেও তারা ভারতের হিন্দুদের সমার্থক মনে করে। সেই বাহিনীর প্রতি যখন কোনো বাঙালি নারী গবেষণার মোড়কে তাদের অন্যায়কে খাটো করে দেখার চেষ্টা করেন, তখন এটিই অনুধাবন করি— আসলেই আইএসআই খুবই শক্তিশালী, প্রভাবশালী, কর্মক্ষম আইনি সন্ত্রাসী একটি প্রতিষ্ঠান।

Print

Editor: Abed Khan

Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,

Phone: 8802-9889821, 8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,

E-mail: [info@shamokalbd.com](mailto:info@shamokalbd.com)

If you feel any problem please contact us at: [webinfo@shamokalbd.com](mailto:webinfo@shamokalbd.com)

**Powered By: NavanaSoft**